POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly **BADAR** Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 21

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 21 মে, 2020 27 রমযান 1441 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِہِنَّ نِحۡلَۃً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَکُمۡ عَنۡ شَیۡءٍ مِّنۡہُ نَفۡسًا فَکُلُوۡہُ ہَنِیۡٓــًٔا مَّرِیۡٓــًٔا ۝

এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের দেন-মহর স্বেচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৫)

আহমদীয়া সংবাদ

১৫ই মে, ২০২০ শুক্রবার সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) অসুস্থতার কারণে খুতবা প্রদান করেন নি।

জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। আমীন।

রমানের শেষ দশদিনে পূর্বের থেকে বেশি আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হোন, বিনয়পূর্ণ দোয়া করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে দয়া ও কৃপা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর শারিরিক অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি

১৫ই মে, ২০২০ শুক্রবার সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খুতবা প্রদান করেন নি। তিনি সেদিন জামাতের নামে একটি বার্তা দেন যা হুযুর আনোয়ারের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় মুনীর আহমদ জাভেদ সাহেবের মাধ্যমে জামাতের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন:

আমার আক্ষেপ হচ্ছে যে আজ আমি জুমআ পড়াতে পারব না, কেননা কিছু দিন পূর্বে বাড়ির আঙিনায় হাঁটার সময় Mat (পাপোষ)এ হোঁচট খেয়ে পা পিছলে যায়, যার ফলে পাকা জায়গায় পড়ে আমার কপালে ও নাকে আঘাত লেগেছে। এই কারণে জুমআ পড়াতে সমস্যা হবে। ডাক্তারও বিশ্রাম করার পরামর্শ দিয়েছেন। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করেন এবং পরবর্তী জুমআ পড়াতে পারি। (ইনশাআল্লাহ্)

এছাড়াও এখন রমযানের শেষ দশদিন চলছে। এই দিনগুলিতে জামাতের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন জামাতকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং স্বীয় নিরাপত্তায় রাখেন। সম্প্রতি পাকিস্তানে রাজনীতিক এবং সংবাদমাধ্যমও জামাতের প্রবল বিরোধীতা করছে, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল হযরত খাতামুল আম্বিয়ার মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর নামে রাজনীতি করছে এবং আহমদীদেরকে এরই ভিত্তিতে বেশি করে টার্গেট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে এবং সমগ্র জাতিকে তাদের এই রাজনৈতিক কৌশলের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন। যাইহোক আমাদের কাজ হল তাদের প্রত্যেকটি আক্রমণের উত্তরে দোয়া করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হওয়া। রমানের শেষ দশদিনে পূর্বের থেকে বেশি আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হোন, বিনয়পূর্ণ দোয়া করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে দয়া ও কৃপা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

এরপর ডাক্তার মাননীয় শাব্বীর আহমদ ভট্টী সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মেডিকেল রিপোর্ট জামাতের সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন।

ডাক্তার বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.) পড়ে যাওয়ার কারণে কপালে এবং হাঁটুতে আঘাত লেগেছে। খোদা তা'লার বিশেষ কৃপায় আঘাতগুলি গভীর বা গুরুতর নয়। কপাল এবং শরীরের অন্যান্য অংশে গুরুতর আঘাত লাগে নি। সামান্য ফুলে আছে যা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ পূর্ণ আরোগ্য লাভ হবে। হুযুর-এর হাঁটা চলা করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না আর সামগ্রিকভাবে শারিরিক অবস্থা বেশ ভাল আছে। আলহামদো লিল্লাহ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে বিনীত অনুরোধ করা হয়েছিল যে তিনি যেন কিছু দিন বিশ্রাম করেন, এমনকি জুমআও যেন না পড়ান। হুযুর আনোয়ার সহৃদয়তাপূর্বক সেই অনুরোধ রেখেছেন। জাযাকুমুল্লাহ॥

****

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর শারিরিক অবস্থা সম্পর্কে ডাক্তার মাননীয় শাব্বীর আহমদ ভট্টী সাহেবের সাম্প্রতিক রিপোর্ট (১৭ই মে, বুধবার)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হুযুর আনোয়ার-এর শারিরিক অবস্থা আজ অনেক ভাল ছিল। ব্যাথাও কমেছে, কপাল নাক এবং হাঁটুর ক্ষতগুলি সন্তোষজনকভাবে সেরে উঠছে। আলহামদোলিল্লাহ। হুযুর আনোয়ার (আই.) চিঠিপত্রও দেখছেন এবং জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়াও করছেন। আপনারাও প্রিয় হুযুরের জন্য বেদনাতুর হৃদয়ে দোয়া অব্যাহত রাখুন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ কৃপাগুণে হুযুরকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করেন যাতে আগামী জুমআয় আমরা তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।

জামাতের সদস্যরা প্রিয় ইমাম সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকুন।

اَللّٰھُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذۡھِبِ الۡبَأۡسَ، اِشۡفِ اَنۡتَ الشَّافِیۡ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُکَ، شِفَاءً لَّا یُغَادِرُ سَقَمًا

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

দরসুল কুরআন

কুরআন মজীদের শেষ তিনটি সূরার দরস

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে উদিত প্রভাত থেকে লাভবান হওয়া এবং সূরাগুলিতে বর্ণিত দোয়া এবং নিজেদের আমল দ্বারা দাজ্জালের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপদেশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত তফসীরের আলোকে এই সূরাগুলির মারেফাতপূর্ণ তফসীর

কতিপয় মসনুন দোয়া এবং হযরত মসীহ মওউ (আ.)-এর ইলহামী দোয়া সম্পর্কে আলোচনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-কর্তৃক প্রদত্ত দরসুল কুরআন, সময়কাল-২৯ শে রমযান, ১৪৪০ হিজরী, ইং ৪ঠা জুন, ২০১৯, মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ إِلٰهِ النَّاسِ۔ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔
الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

সূরা ইখলাসের অনুবাদ হল, তুমি বল, ‘তিনিই আল্লাহ্, একক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং স্বনির্ভর স্থল। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই। এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।

এরপর সূরা ফালাক: এর অনুবাদ - ‘তুমি বল,‘আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে, এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকার-কারিণীদের অনিষ্ট হইতে, এবং হিংসুকদের অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসা করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একস্থানে বলেন, সৌন্দর্য এমন এক জিনিসি, যার দিকে হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং তা দর্শনে স্বভাবতই প্রেমের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ মহান পরাৎপর স্রষ্টার সৌন্দর্য হল তাঁর একত্ব, গৌরব এবং গুণাবলী। যেমন, খোদা তা'লা কুরআনে বলেন:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ۔

অর্থাৎ , “ খোদা তার সত্তা, গুণ ও মহিমায় এক-অদ্বিতীয়। কেউ তাঁর অংশীদার নয়। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। অনু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে জীবনপ্রাপ্ত হয়। তিনি সকল বস্তুর জন্য কল্যাণের উৎস এবং তিনি কাহারও কল্যাণে অভিষিক্ত নন। তিনি না কাহারও পুত্র, না কাহারও পিতা। তা সম্ভবই বা কিরূপে? কেননা, তাঁর কোনও সম-সত্তা নেই।”

কুরআন বার বার খোদার কথা উপস্থিত করে এবং তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রদর্শন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেখ! এহেন খোদাই হৃদয়ের প্রিয়তম হতে পারেন। মৃত, দুর্বল, কম দয়াবান বা কম শক্তি ও মহিমার অধিকারী কেউ হৃদয়ের কাম্য হতে পারে না।”

(ইসলামী ওসূল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃ: ৪১৭)

এরপ আল্লাহর নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

“কুরআন-এর পরিভাষার দিক থেকে আল্লাহ্ সেই সত্তার নাম যাঁর সকল গুণাবলী সৌন্দর্য ও কৃপার পরাকাষ্ঠা, যাঁর সত্তায় কোনও ত্রুটি নেই। কুরআন শরীফে কেবল আল্লাহর নামকেই সকল গুণাবলীর আধার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ” অর্থাৎ এই সমস্ত গুণাবলী আল্লাহর নামের মধ্যে রয়েছে। কুরআন করীম আল্লাহর নামে এই সমস্ত গুণাবলী রেখেছে। “ যাতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যায় যে আল্লাহর নাম সেই সময় প্রযোজ্য হয় যখন সকল পরিপূর্ণ গুণাবলী তার মধ্যে পাওয়া যায়।”

(আইয়ামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৪৭)

এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আল্লাহর নামে সমস্ত গুণাবলী অন্তর্নিহিত রয়েছে, বরং বলা যায় যে সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী, যাঁর মধ্যে কোনও দুর্বলতা নেই। আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আদি ও অনাদি, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা, যিনি সব কিছুর মালিক ও স্রষ্টা, সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। আল্লাহ্ সেই সত্তার নাম যিনি সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। আল্লাহ্ খোদা তা'লার মৌলিক নাম। অন্য কোন ধর্মে এই নাম দেওয়া হয় নি, বরং ইসলামেই এই নাম পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লার নাম কেবল কুরআন করীমে রয়েছে, অন্য কোনও শরীয়ত বিধানে এই মৌলিক নাম লক্ষ্য করা যায় না। তিনিই সেই খোদা যিনি নিজ সত্তায় এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনও অংশীদার নেই।

কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে নিখাদ একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নাস্তিকদের ধারণা, খোদা তা'লার কোনও অস্তিত্ব নেই, পৃথিবী নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, কোনও খোদার হস্তক্ষেপ এই পৃথিবীতে নেই। তাদের ধারণা আমরা নিজেদের ইচ্ছে ও শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,তাদের কাছে স্পষ্ট করে দাও যে তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব আছে, আর তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত এক সত্তা, যিনি সকল গুণের আধার, যাঁর গুণাবলী সতত নিত্যনতুন রূপে উদ্ভাসিত। খোদা তা'লা বলেন, তোমরা জীবন ধারণের উপকরণের জন্য আমার কাছেই ঋণী। তোমরা আমার মুখাপেক্ষী। সূর্য, আলো, বায়ু, আবোহাওয়া, জল,মাটি এই সব কিছু কি তোমরা সৃষ্টি করেছ? এই সব কিছু খোদা তা'লার সৃষ্টি। আর যদি খোদা তা'লার কেবল প্রতিপালনের গুণের দিকটিকেই ধরা হয়, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রতিপালন গুণ ব্যতিরেকে তোমরা কেউই জীবিত থাকতে পার না। আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত গুণটিকেই ধরুন। এই গুণটির কারণেই মানুষের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করতে থাকেন, বরং জীবন প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তিনি কোটি কোটি বছর পূর্বেই উপকরণ ও উপাদান তৈরী করে রেখেছেন। যেমন, জলের উদাহরণটি নিন। জল শেষ হয়ে গেল প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এরা কি পানি তৈরী করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

তুমি বল, ‘তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি তোমাদের (সব) পানি ভূগর্ভে উধাও হইয়া যায়, তাহা হইলে কে আছে যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনিয়া দিবে।’ (আল মুলুক: ৩১)

এর দ্বারা আধ্যাত্মিক পানিকে বোঝানো হতে পারে আবার আক্ষরিক পানিও বোঝানো হতে পারে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বুঝতে পারব যে খোদা তা'লাকে ভুলে গিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক পানি শেষ হয়ে গেছে। আক্ষরিক পানি সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন তা শেষ হতে পারে। তোমাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সত্ত্বেও, তোমরা আমার অংশীদার তৈরী কর এবং আমার সত্তার উপর তোমাদের ঈমান না থাকা সত্ত্বেও আমার রহমানীয়্যত বা অযাচিত দানশীলতা এবং প্রতিপালন গুণের কারণে তোমরা এই সব কিছু প্রাপ্ত হচ্ছ। বৃষ্টি না হলে হাহাকার শুরু হয়ে যায়, কিন্তু আমরা যারা খোদার উপর ঈমান এনেছি তাঁর কুদরত প্রত্যক্ষ করেছি, তারা এমন বহু ঘটনার সাক্ষী যেগুলি আমি একাধিক বার বর্ণনাও করেছি যে বৃষ্টি হচ্ছে না, অনাবৃষ্টি বা খরার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তারপর ভীষণভাবে বৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমাদের মিশনারী এখানে লিখেছেন, আমি দোয়া করেছি, তাদেরকে মানুষদের একত্রিত করে ‘ইসতেসকা’-র নামায পড়তে বলেছি। মানুষ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে যে আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এই ঘটনাক্রম সেখানকার মানুষদের ঈমানকে উজ্জীবিত করার কারণ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় তাদের ঈমান তৈরী করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

(শেষাংশ ৮ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

আব্দুর রহমান বলেন, আমি এই ইশারা করতেই সেই দু'যুবক বাজপাখির ন্যায় ঝাপিয়ে শত্রুসারি বিদীর্ণ করে চোখের পলকে সেখানে পৌঁছে যায় আর এত তড়িৎগতিতে আক্রমণ করে যে, আবু জাহল ও তার সাথিরা সম্বিত হারিয়ে বসে। আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত মাআয বিন হারিস (রা.)-এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা।

দুই মুসলমান যুবকের হাতে মক্কার কাফের সর্দার বধের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

খিলাফতের প্রকৃত অনুরাগী, পূর্ণ অনুগত্যকারী, বীর ও কলেমার রক্ষক, আল্লাহ্‌র পথে বন্দী এবং জামাতের বিশেষ নিরাপত্তা দলের সদস্য পরম নিষ্ঠাবান সেবক মাননীয় রানা নাঈম উদ্দীন সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর প্রশংসা সূচক গুণাবলীর উল্লেখ ও স্মৃতিচারণ।

"আমি তাঁর মুখে সব সময় গভীর প্রশান্তি এবং খিলাফতের জন্য ভালবাসা দেখেছি"

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউকে) থেকে ১৭ এপ্রিল, ২০২০, তারিখে প্রদত্ত খুতবা (১৭ শাহাদত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ বদরী সাহাবীদের মধ্য হতে আমি হযরত মুআয বিন হারেস (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করব। হযরত মুআয (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু মালেক বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। হযরত মুআয (রা.)-এর পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফাআ এবং মায়ের নাম ছিল আফরা বিনতে উবায়েদ। হযরত মুয়াওয়েয এবং হযরত অওফ তার ভাই ছিলেন। এই তিন ভাইয়ের সবাই নিজ পিতার পাশাপাশি মায়ের নামেও পরিচিত ছিলেন আর এদের তিনজনকে বনু আফরাও বলা হতো। হযরত মুআয এবং তাঁর ভাই হযরত অওফ ও হযরত মুয়াওয়েয বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত অওফ এবং হযরত মুয়াওয়েয উভয়েই বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু হযরত মুআয (রা.) পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত মুআয বিন হারেস এবং হযরত রাফে বিন মালিক জুরখী (রা.) সেই প্রাথমিক আনসারদের অন্যতম যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি মক্কায় ঈমান আনয়ন করেছিলেন। হযরত মুআয সেই আট আনসার সদস্যের একজন ছিলেন যারা আকাবার প্রথম বয়আতে মহানবী (সা.)-এর প্রতি মক্কায় ঈমান আনয়ন করেছিলেন। একইভাবে হযরত মুআয (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও উপস্থিত ছিলেন। হযরত মা'মার বিন হারেস যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তার এবং হযরত মুআয বিন হারেসের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৯০-১৯১) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

আবু জাহলের হত্যার বিস্তারিত বিবরণ যদিও বিগত বছরের খুতবায় তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু এখানেও বর্ণনা করা আবশ্যক তাই বর্ণনা করছি। এখানে হযরত মুআয (রা.)-এর সাথে উক্ত ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো বুখারীর রেওয়ায়েত যা আমি উপস্থাপন করব। এই রেওয়ায়েতের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বুখারীর পূর্ণ রেওয়ায়েতই পড়তে হবে।

সালেহ বিন ইব্রাহীম তার দাদা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি আমার ডানে ও বামে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, দু'পাশে স্বল্প বয়সী দুই আনাসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাসনা হয় যে, হায়! আমি যদি এমন দু'যোদ্ধার মাঝে থাকতাম যারা এদের চেয়ে বেশি বয়স্ক ও অধিক বলিষ্ঠ হতো! ইত্যবসরে তাদের একজন আমার হাত চেপে জিজ্ঞেস করে যে, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ ভাতিজা! তা জেনে তোমার কী কাজ? সে বলে, আমাকে বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালিগালাজ করে। আর সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাকে একবার দেখতে পাই তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমার চোখ তার চোখ থেকে সরবে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, আমি একথা শুনে খুবই আশ্চার্যান্বিত হই। এরপর অপরজন আমার হাত চেপে একইভাবে প্রশ্ন করে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমি আবু জাহলকে দেখলাম সে তার লোকদেরকে প্রদক্ষিণ করছে। আমি বললাম, দেখ! ঐ হলো তোমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। একথা শোনামাত্রই তারা দু'জন ক্ষিপ্রতার সাথে নিজ নিজ তরবারি নিয়ে তার দিকে ছুটে যায় এবং আঘাত করতে করতে তাকে মেরে ফেলে। এরপর তারা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝ থেকে কে তাকে হত্যা করেছে? উভয়ে বলে, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা বলে, না। তিনি (সা.) তরবারি দু'টি দেখে বলেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এরপর বলেন, তার সম্পদ মুআয বিন আমর বিন জমুহ (রা.) পাবে আর তাদের উভয়ের নাম ছিল মুআয অর্থাৎ মুআয বিন আফরা (রা.) এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ (রা.)। এটি সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত। (সহী বুখারী, কিতাবু ফারযুল খামস, হাদীস-৩১৪১)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেন, আবু জাহলের পরিনতি কী হয়েছে– তা কে দেখতে যাবে? হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরার দুই পুত্র হযরত মুআয এবং হযরত মুয়াওয়েয (রা.) তরবারি দ্বারা এত বেশি আঘাত করেছে

যে, সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইব নে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি আবু জাহলের দাড়ি ধরি। তখন আবু জাহল বলে, আমার চেয়ে বড় কোন ব্যক্তিকে কি তোমরা হত্যা করেছ? অথবা সে বলে, তার চেয়ে মহান কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তার জাতি হত্যা করেছে? আহমদ বিন ইউনুস তার রেওয়ায়েতে বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊ দ (রা.) তাকে এভাবে বলেছেন যে, তুমিই কি আবু জাহল? এটিও বুখারীর হাদীস।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৩৯৬২)

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন,

কতক রেওয়ায়েত অনুসারে আফরার দুই পুত্র মুয়াওয়েয (রা.) এবং মুআয (রা.) মিলে আবু জাহলকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর তার মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)। বুখারী কিতাবুল মাগাযীতে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে, সম্ভবত মুআয বিন আমর (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.)'র পর মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.)'ও তার ওপর আঘাত হেনে থাকবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফারযুল খামস, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৯১ থেকে চয়নকৃত)

বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের হত্যায় কে কে অংশগ্রহণ করেছিল-এ বিষয়ে এক জায়গায় এভাবে বিস্তারিত জানা যায়-

অর্থাৎ ইবনে হিশাম আল্লামা ইবনে ইসহাকের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) আবু জাহলের পা কেটে দেন যার ফলে সে পড়ে যায় আর ইকরামা বিন আবু জাহল হযরত মুআযের হাতে তরবারির আঘাত হানে, যার ফলে তার হাত বা বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.) আবু জাহলের ওপর আক্রমণকরেন যার ফলে সে ভূপাতিত হয়। কিন্তু তার মাঝে তখনও প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊ দ (রা.) তার মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। মহানবী (সা.) যখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊ দ (রা.)-কে নিহতদের মাঝে আবু জাহলকে সন্ধান করার নির্দেশ দেন তখন তিনি তার মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। সহীহ মুসলিমের হাদীস অনুযায়ী আফরার দুই পুত্র আবু জাহলের ওপর আক্রমণ করেছিলেন আর সেই হামলার ফলে সে প্রাণ হারায়। একইভাবে বুখারীতে আবু জাহলের হত্যার পরিচ্ছেদেও এমনটিই উল্লেখ রয়েছে। ইমাম কুরতুবীর মতে এটি ভুল ধারণা যে, আফরার দুই পুত্রই আবু জাহলকে হত্যা করেছিল। তিনি বলেন, কতক বর্ণনাকারীর কাছে মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.)-এর পরিচিতির বিষয়টি অস্পষ্ট অর্থাৎ মুআয বিন আফরা (রা.) নয় বরং তিনি ছিলেন মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.), যাকে লোকেরা মুআয বিন আফরা (রা.) ধরে নিয়েছে। তিনি বলেন, মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) মুআয বিন আফরা (রা.)-এর সাথে গুলিয়ে গেছেন। আল্লামা ইবনুল জওযী বলেন, মুআয বিন জমুহ্ (রা.) আফরার সন্তানদের কেউ নন আর মুআয বিন আফরা (রা.) আবু জাহলকে হত্যাকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত মুআয বিন আফরা (রা.)-এর কোন ভাই অথবা চাচা সেসময় উপস্থিত ছিলেন অথবা রেওয়ায়েতে আফরার এক পুত্রের উল্লেখ হয়েছে আর রাবী ভুলে দুই ছেলের উল্লেখ করেছেন। যাহোক, আবু উমর বলেন, এই হাদীসের চেয়ে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর হাদীস অধিকতর সঠিক যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে আফরা আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন, অর্থাৎ আফরা-এর এক পুত্র ছিল। ইবনে তীন বলেন, হতে পারে, দুই মুআয অর্থাৎ মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ আর মুআয বিন আফরা' মায়ের দিক থেকে ভাই ছিলেন অথবা তারা দুজন দুধভাই ছিলেন। আল্লামা দাউদীর মতে আফরার দুই পুত্র বলতে সাহল ও সোহেলকে বুঝায়। আর বলা হয়, এরা দুজনই হলো, মুয়াওয়েয ও মুআয।

(উমদাতুল কারী, খণ্ড-১৫, পৃ: ১০০, দারুল ফিকর, বেরুত থেকে মুদ্রিত)

যাহোক, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিন জন হত্যা করেছে আর কোন কোনটিতে রয়েছে দুই জন; আর এতে মুআয বিন হারেসেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বদরের যুদ্ধের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তাতে আবু জাহলকে হত্যার ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

রণক্ষেত্রে অবিরাম হত্যা ও রক্তপাত ঘটছিল। মুসলমানদের সামনে তাদের তিন গুণ বড় সৈন্যদল ছিল, যারা সকল প্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে নিরীহ মুসলমানরা সংখ্যায় কম, সাজ-সরঞ্জাম স্বল্প, দারিদ্র্য ও দেশবিতাড়িত হওয়ার দুঃখে জর্জরিত আর বাহ্যিক উপায় উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কাবাসীদের সামনে মাত্র কয়েক মিনিটের শিকার ছিল। কিন্তু এক খোদা ও রসূলের ভালোবাসা তাদেরকে পাগলপারা বানিয়ে রেখেছিল। জীবন্ত ঈমান, যা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কোন জিনিস নেই, তাদের মাঝে এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করে রেখেছিল। তারা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মসেবার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিলেন যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতামূলকভাবে খোদার পথে জীবন উৎসর্গের জন্য উদগ্রীব ছিল। হামযা (রা.), আলী (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) শত্রুদের সারিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। আনসারদের নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা এমন ছিল যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমি আমার ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি আনসারদের দুই অল্পবয়সী যুবক আমার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে দেখে আমার মনোবল কিছুটা কমে যায়, কেননা এ ধরনের যুদ্ধে ডানবামের সাথির ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। আর সেই ব্যক্তিই ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে যার দুই পার্শ্ব নিরাপদ থাকে। কিন্তু আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি এই উৎকণ্ঠায় ছিলাম, এরই মধ্যে উক্ত ছেলেদের একজন চুপিসারে আমাকে জিজ্ঞেস করে, চাচা! সেই আবু জাহল কোথায় যে মক্কায় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত? খোদার সাথে আমি এ অঙ্গীকার করেছি যে, আমি তাকে হত্যা করব বা তাকে হত্যা চেষ্টায় নিজেই নিহত হব- মনে হচ্ছিল সে বিপরীত পাশে থাকা অপরজন থেকে এ কথা গোপন রাখতে চাচ্ছে। আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, তাকে উত্তর দেওয়ার পূর্বেই অপর দিক থেকে অপরজনও চুপিসারে আমাকে একই প্রশ্ন করে। আমি তাদের সৎসাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। কেননা আবু জাহল ছিল সেনাপতিতুল্য আর তার চতুর্দিকে রণকুশল যোদ্ধারা সমবেত ছিল। আমি হাতের ইশারায় বলি যে, ঐ হলো আবু জাহল। আব্দুর রহমান বলেন, আমি এই ইশারা করতেই সেই দু'যুবক বাজপাখির ন্যায় ঝাপিয়ে শত্রুসারি বিদীর্ণ করে চোখের পলকে সেখানে পৌঁছে যায় আর এত তড়িৎগতিতে আক্রমণ করে যে, আবু জাহল ও তার সাথিরা সম্বিত হারিয়ে বসে। আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইকরামা বিন আবু জাহলও তার পিতার সাথেই ছিল। সে তার পিতাকে বাঁচাতে না পারলেও পিছন থেকে মুআযের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করে যে, তার বাম হাত দেহবিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকে। মুআয ইকরামাকে ধাওয়া করেন কিন্তু সে নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করে। যেহেতু কাটা হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে সমস্যা হচ্ছিল তাই হযরত মুআয সেটিকে সজোরে টান দিয়ে নিজের দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেন আর পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন।"

(সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে,

"আবু জাহল, যার জন্মের পর কয়েক সপ্তাহব্যাপী উট জবাই করে মানুষের মাঝে মাংস বিলি করা হয়েছিল, তার জন্মে ঢোলের আওয়াজে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এমনভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে আর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তার জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপন করা হয় যে, মক্কার আকাশ-বাতাসও গুঞ্জরিত হয়। তিনি (রা.) আরো লিখেন, আর বদরের যুদ্ধে সে যখন মারা যায় তখন পনের বছরের স্বল্পবয়স্ক দুই আনসারী বালকের আঘাতের ফলে সে মারা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, যুদ্ধের পর সবাই যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি আহতদের দেখতে যুদ্ধের ময়দানে যাই। তিনি (রা.)-ও মক্কার অধিবাসী ছিলেন, যে কারণে আবু জাহল তাকে ভালোভাবে চিনত। তিনি (রা.) বলেন, আমি যুদ্ধের ময়দানে ঘুরছিলাম। সহসা দেখি, আবু জাহল আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। আমি যখন তার কাছে

যাই তখন সে আমাকে বলে, আমি বাঁচবো বলে মনে হচ্ছে না। ব্যথা অনেক বেড়ে গেছে। তুমিও যেহেতু মক্কার অধিবাসী তাই আমার ইচ্ছা হলো, তুমি আমাকে হত্যা কর যাতে আমার কষ্ট দূর হয়। কিন্তু তুমি জান যে, আমি আরবের নেতা। আর আরবের রীতি হলো, নেতাদের ঘাড় লম্বা রেখে কাটা হয় এবং এটি প্রমাণ বহন করে যে, নিহত ব্যক্তি নেতা ছিল। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার ঘাড় লম্বা করে কাটবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি তার ঘাড় চিবু কের একেবারে নীচ থেকে কাটলাম এবং বললাম, তোমার এই শেষ বাসনাটুকুও পূর্ণ করা হবে না। পরিণতি দেখলে বুঝা যায় যে, আবু জাহল, যার গর্দান জীবিতাবস্থায় সর্বদা উঁচু থাকতো, তার মৃত্যু কত লাঞ্ছনাজনক ছিল, অর্থাৎ সেই ঘাড় মৃত্যুর সময় চিবুক বরাবর কেটে ফেলা হয় আর তার শেষ বাসনা পূর্ণ হয় নি।" (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০১)

হযরত রুবাই বিনতে মুয়াওয়েয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার চাচা হযরত মুআয বিন আফরা (রা.) আমাকে কিছু তাজা খেজুরসহ মহানবী (সা.)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন। তখন মহানবী (সা.) আমাকে কিছু অলঙ্কার প্রদান করেন যা তাঁকে (সা.) বাহরাইনের শাসক উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত রুবাই বিনতে মুয়াওয়েয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার চাচা হযরত মুআয (রা.) আমার হাতে মহানবী (সা.)-এর সকাসে একটি উপহার প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি (সা.) তাকে কিছু অলঙ্কার উপহার দেন যা বাহরাইনের শাসকের পক্ষ থেকে তিনি (সা.) পেয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর লিখেন, ইসলামের বিস্তার লাভের পর মহানবী (সা.) বাদশাহগণের নামে পত্র লিখেছিলেন এবং তাদেরকে উপহার প্রেরণ করেছিলেন তখন বাহরাইনের শাসক এবং অন্যান্য বাদশাহরাও মহানবী (সা.)-এর সকাসে পত্র লেখেন এবং নানাবিধ উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

হযরত মুআয বিন হারেস (রা.) চার বিয়ে করেছিলেন যার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ- প্রথম স্ত্রী হলেন, হাবীবা বিনতে কায়েস, যার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন, উম্মে হারেস বিনতে সুবরা, যার গর্ভে হারেস, অওফ, সালমা, উম্মে আব্দুল্লাহ্ এবং রামলা জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় স্ত্রী হলেন, উম্মে আব্দুল্লাহ্ বিনতে নুমায়ের, যার গর্ভে ইব্রাহীম এবং আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। আর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন, উম্মে সাবিত রামলা বিনতে হারেস, যার গর্ভে সারা জন্মগ্রহণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩-৩৭৪)

হযরত মুআয (রা.)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে আসীর তার পুস্তক 'উসদুল গাবা'-তে বিভিন্ন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এক উক্তি অনুসারে, হযরত মুআয (রা.) বদরের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং মদীনায় ফিরে আসার পর সেই ক্ষতের কারণেই মৃত্যুবরণ করেন। আরেকটি ভাষ্য অনুযায়ী তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অপর এক উক্তি অনুসারে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন; হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। সিফফিনের যুদ্ধ ৩৬ ও ৩৭ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত মুআয সেই যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৯১) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪০৯-১৪১০, দারুল জীল বেরুত থেকে প্রকাশিত)

যাহোক, তার মৃত্যুর বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে; এমন কিছু বিবরণ রয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। সন্তান ও স্ত্রীদের বিষয়টিও যদি বিবেচনা করা হয় তবে তা থেকেও এটি-ই বোঝা যায়।

এই সাহাবীর স্মৃতিচারণের পর এখন আমি মোকাররম মুন্সী ফিরোয দীন সাহেবের পুত্র মোকাররম রানা নঈম উদ্দীন সাহেবের স্মৃতিচারণ করব, যিনি গত ১৯ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে পরলোকগমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন; বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন আর প্রতিবারই ডাক্তার বলতেন, এটি তার অন্তিম সময়। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসতেন। যখনই সুস্থ হতেন আর চলাফেরা করতে পারতেন তখন এখানেও মসজিদে আসা-যাওয়া শুরু করে দিতেন। যাহোক, সর্বশেষ এই অসুস্থতা তার জন্য প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নথিপত্র অনুযায়ী রানা সাহেবের জন্ম হয় ১৯৩৪ সালে, অপরাপর রেওয়ায়েত অনুসারে ১৯৩০ বা ৩২ সালে। নথিপত্র অনুযায়ী যেহেতু (জন্ম) ৩৪ সালে, সেই হিসেবে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ফিরোয দীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯০৬ সালে পত্রযোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে দেশ-বিভাগের পর অর্থাৎ যখন ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হয়ে যায়, তখন এই পরিবার পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে তারা লাহোরে ছিলেন, পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে রানা সাহেব রাবওয়ায় চলে আসেন। এরপর তিনি নিজেকে ফুরকান ব্যাটালিয়নের জন্য উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রানা সাহেবকে মিরপুর-খাসের কাছে অবস্থিত জমিজমার দেখাশুনার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেন। তিনি অনেক আগেই ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন, ১৯৫১ সালে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তার সহধর্মিনীর নাম ছিল সারাহ পারভীন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী দৌলত খান সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। তার সম্পর্কে প্রাপ্ত দাপ্তরিক রেকর্ড অনুসারে অর্থাৎ নিরাপত্তা বিভাগের রেজিস্টার অনুযায়ী ৩ আগস্ট, ১৯৫৪ সালে 'রিজার্ভ অন ডিউটি' হিসেবে রানা নঈম উদ্দীন সাহেবের পদায়ন হয়। এরপর ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৫৯ সালের ১১ মে পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগে গার্ড হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তফসীর প্রণয়নের কাজে যখন নাখলা-জাবায় যেতেন এবং কয়েক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। মরহুম তখন সেখানে নিরাপত্তা ও ডিজেল-চালিত জেনারেটরের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতেন; সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। সেখানে আবাদকৃত এই ছোট্ট জায়গার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল।

ওসীয়্যত দপ্তরের রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে তিনি বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি সাহিওয়াল জেলার হড়প্পায় চলে যান ও পরবর্তীতে শাহিওয়াল মসজিদের খাদেম হিসেবে কাজ করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে শাহিওয়ালের আহমদীয়া মসজিদে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে, যেখানে তিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন। সেখানে যখন আক্রমণ হয় এবং তিনি এর পাল্টা জবাব দেন, তখন রানা নঈম উদ্দীন সাহেবসহ মোট এগারোজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এভাবে ১৯৮৪ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রানা সাহেব আল্লাহর পথে বন্দিদশায় জীবন কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করেন।

পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে আমাদের জামাতের এগারোজন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং তাদের শাস্তি হয়। এই মামলাটি মিলিটারী কোর্টে রেফার করে দেওয়া হয় যা জিয়াউল হকের যুগে বিশেষ আদালত ছিল। সেখানে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে নিয়মিত শুনানী আরম্ভ হয় এবং ০১ জুন ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত এ শুনানী চলতে থাকে। শুরুতে এই মামলায় এগারো জন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু পরে সাত জনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। তাদের মাঝে রানা নঈম উদ্দীন সাহেবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দু'জন বিদেশ চলে গিয়েছিলেন আর দু'জনকে নির্দোষ খালাস দেওয়া হয়েছিল। এই সাত জনের মামলা স্থগিত ছিল। পরে সেই বিশেষ মিলিটারী কোর্ট মুরব্বী সিলসিলাহ্ ইলিয়াস মুনির সাহেব এবং রানা নাঈম উদ্দীন সাহেবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। অভিযুক্ত বাকি পাঁচজনের প্রত্যেককে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। যাহোক, কোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার পর লাহোর হাইকোর্ট ১৯৯৪ সনের মার্চ মাসে তাদের মুক্তির আদেশ দেয় এবং কাগজপত্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর ১৯ মার্চ ১৯৯৪ সনে তারা মুক্তি লাভ করেন। এভাবে আমাদের কারাবন্দিগণ সাড়ে নয় বছর আল্লাহর পথে বন্দিদশায় জীবন কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই বন্দিদের মুক্তিসংক্রান্ত হাইকোর্টের

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়। ২০১৩ সনের মে মাস থেকে সেটির শুনানী আরম্ভ হয়। এ দু'জন দেশের বাইরে থাকার কারণে উক্ত মামলার কোন অগ্রগতি হয় নি। এখন পর্যন্ত এই মামলা স্থগিত আছে।

বন্দি অবস্থায় পুলিশের পক্ষ থেকে অত্যধিক দৈহিক নির্যাতন করা হয় এবং বলপূর্বক তার কাছ থেকে এই মর্মে বয়ান আদায়ের চেষ্টা করা হতো যে, তুমি যেহেতু তোমাদের খলীফার বডিগার্ড ছিলে তাই তিনি তোমাকে মুসলমানদেরকে এভাবে মারার জন্য পাঠিয়েছে। রানা নঈমউদ্দীন সাহেব এই মামলা হতে নির্দোষ খালাস পাওয়ার পর ১৯৯৪ ইং সনে লন্ডন স্থানান্তরিত হন আর এখানেও নিজ বয়সের নিরিখে সাধ্যাতীতভাবে নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সনে তার বড় মেয়ে মারা যায় এবং এর কিছুদিন পরই তার স্ত্রীও প্রয়াত হন। এরপর তিনি আমার কাছে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি চান; পরিস্থিতি বাহ্যত কঠিন ছিল, যাহোক আমি তাকে বললাম, গিয়ে দ্রুত ফিরে আসুন। তিনি কয়েক দিনের জন্য যান, এরপর ফিরে আসেন।

মরহুম তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার পুত্র ওয়াকেফে জিন্দেগী রানা ওয়াসিম আহমদ সাহেব যুক্তরাজ্যে প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে কাজ করছেন, আর চার কন্যাও লন্ডনেই বসবাস করছে। তার পুত্র লিখেন, আমাদের পিতা আমাদেরকে সর্বদা এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে; সবকিছু খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। নিজেও খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন আর বলতেন, আমি ডিউটি দিতে গিয়ে যখন যুগ-খলীফাকে দেখি তখন যুবক হয়ে যাই। আমি যে এ বয়সেও ডিউটিতে আসি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী- এর পেছনেও রহস্যও এটাই; অন্যথায় আমি তো খাটে পড়ে থাকতাম। তিনি সময়ানুবর্তী ছিলেন; সর্বদা ডিউটির জন্য দুই তিন ঘন্টা পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতেন। আমি যদি বলতাম, আব্বু! এখনও অনেক সময় বাকি; তখন তিনি বলতেন, তাতে কী হয়েছে, ঘরে বসে কী করব?

হিশাম নামের একজন ডাক্তার লিখেন, আমি তার নথিপত্র দেখেছি, তার ফাইল দেখেছি ও পড়েছি; আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এ রোগে এ বয়সে মানুষ তো ঘরে বসে যায় অথবা কেয়ারহোমে চলে যায়, কিন্তু তিনি দিব্যি চলাফেরা করছেন। আর তিনি এই কথাই বলতেন যে, আমার এখানে আসা, যুগ খলীফার সাথে থাকা এবং তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করাই আমার সুস্বাস্থ্যের বা চলাফেরার আসল রহস্য। তার পুত্র রানা সাহেব লিখেন, আমি প্রায়ই তাকে মালিশ করতাম; একদিন তার পা মালিশ করছিলাম, মালিশ করতে করতে তার হাঁটুর কাছে পৌঁছলে তিনি সামান্য আওয়াজ করেন। আমি জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে? তিনি বললেন, কিছু না। যাহোক, আমি পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি বলেন, এগুলো কারাগারের প্রহারের ব্যাথা। সর্বদা ধৈর্য ও সংযমের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। কারাগারে যখন অত্যাচার করা হয় তখন অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রহার করা হয়ে থাকে, বিশেষ করে পাকিস্তানী জেলে। যাহোক, সেখানে তিনি সবকিছু সহ্য করেছেন আর বাহিরে এসেও তার ধৈর্যের মান ছিল অনেক উঁচু। কখনো শরীর খারাপ হলে কাউকে কিছু বলতেন না বরং অধিকাংশ সময় এটাই বলতেন যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি।

খিলাফতের প্রতি তার আনুগত্যের মান কেমন ছিল- এবিষয়ে তিনি বলেন, প্রায় সময় বিভিন্ন ঘটনা শোনাতে বলতাম একবার আমি আমার পিতার কাছে বসেছিলাম, তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যখন নাখলা-জাবায় গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তফসীর লিখছিলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম, আমি যেমনটি ইতিপূর্বে বলেছি যে, তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি বলেন, তখন কোন কারণে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) রানা নঈম উদ্দিন সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হন] আর আমাকে বলেন, তুমি মসজিদে চলে যাও, সেখানে গিয়ে ইস্তেগফার কর। তিনি বলেন, আমি মসজিদে চলে যাই। জাবায় ছোট্ট একটি মাটির মসজিদ ও কাঁচা আঙিনা ছিল। আমি মসজিদের আঙিনায় বসে ইস্তেগফার করতে থাকি। পরক্ষণেই প্রবল ঝড় আসে ও বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, কিন্তু আমি আমার জায়গাতেই বসে ইস্তেগফার করছিলাম, যখন অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায় আর মসজিদের যে ছাউনি ছিল তা-ও উড়ে যায়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, নঈম কোথায় গেছে? কয়েকজন আমার খোঁজে মসজিদে আসে আর বলে যে, হুযূর (রা.) তোমাকে ডাকছেন। আমি যখন হুযূরের অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি জানতাম যে, তুমি সেখানেই বসে থাকবে। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। পুনরায় তার পুত্র পিতার বরাতে লিখেন যে, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তফসীর লিখা আরম্ভ করেন তখন আমার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি এর উল্লেখ করতেন এবং আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন। তার স্বভাব ছিল, তিনি তার আনন্দের কথা সবার সাথে ভাগাভাগি করতেন কিন্তু তার দুঃখ-কষ্ট কখনো কাউকে বলতেন না।

মরহুমের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ও প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। রানা ওয়াসিম জীবন উৎসর্গ করেছেন। ওয়াকফ গৃহীত হওয়ার পর একদিন তিনি ওয়াসিমকে বলেন, এটি অনেক বড় দায়িত্ব, সর্বদা তওবা ইস্তেগফারে রত থেকে ওয়াকফ এর দায়িত্ব পালন করবে। কেউ কখনো কোন কষ্ট দিলেও চুপ থাকবে, কোন ধরনের তর্কে জড়াবে না। সব বিষয় আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিবে, ধৈর্য ধারণ করবে, কখনোই ধৈর্যহারা হবে না, আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। তিনি পরম বন্ধুর ন্যায় আমাকে উপদেশ দিতেন। তারপর বলেন, আমার স্ত্রী তথা তার পুত্রবধূর সাথেও বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন, বরং নিজ মেয়েদের চেয়েও উত্তম ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে আরো একটি কথা বলেছেন যে, রাবওয়ায় হযরত আম্মাজানের দ্বাররক্ষী হওয়ার সম্মানও তিনি লাভ করেছেন। তিনি নিজে ওসীয়ত করার পর তার অন্যান্য আত্মীয়দেরও ওসীয়ত করার করার জন্য নসীহত করতেন। চাঁদার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে চাঁদা আদায় করতেন আর এরপর অন্যান্য খরচ করতেন। তিনি সর্বদা গোপনে অনেক লোককে আর্থিক সহযোগিতা করতেন আর কখনো কারো কাছে এর উল্লেখ করতেন না। তার মেয়েরা লিখেছে যে, খিলাফতের সাথে বাবার সম্পর্ক ছিল ঈর্ষণীয়। তার শিরা উপশিরায় খিলাফতের ভালোবাসা ছিল। যখনই যুগ খলীফার কথা হতো, তার চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে যেত।

কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মানের একটি ঘটনা তার মেয়ে লিখেছেন যে, একবার আমরা সব বোনেরা মুলাকাতের উদ্দেশ্যে বাবার সাথে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরে বসেছিলাম এবং ভেতরে গিয়ে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ আমরা দেখি যে, বাবা এলার্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যান যেভাবে ডিউটিরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা অবাক হয়ে যাই যে, হঠাৎ কী হলো? তখন সামান্য মাথা উঠিয়ে তাকালে দেখতে পাই যে, নিরাপত্তা বিভাগের নায়েব অফিসার কোন কাজে দপ্তরে এসেছিলেন অথবা ডিউটির জন্য এসেছিলেন। তার সম্মানার্থে আমার বাবা দাঁড়িয়ে যান এবং যতক্ষণ তিনি সেখানে ছিলেন বাবাও দাঁড়িয়ে থাকেন। যখন তিনি বাহিরে চলে যান তখন আমার বাবা বসে পড়েন। তিনি বলেন, এটি মাত্র কয়েক মিনিটের বিষয় ছিল, কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছে। আমাদেরকে সারাজীবন তিনি এই নসীহত-ই করেছেন যে, জীবনকে সার্থক করতে চাইলে খিলাফতের সাথে এমনভাবে আঁকড়ে থাক যেভাবে লোহা চুম্বকের সাথে জুড়ে থাকে।এরপর তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমাদের চার বোন, ভাই ও ভাবীকে বাবা যখন ঈদের উপহার দেন তখন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বাবা! এখনও তো রমজান মাসই আরম্ভ হয় নি; উত্তরে তিনি বলেন, জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়। অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজ সন্তানদেরকে তিনি ঈদের উপহারও দিয়ে গিয়েছেন।

তার পুত্রবধূ বর্ণনা করেন যে, আমার প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন। সর্বদা পিতার মতো আমাকে নসীহত করতেন। যখন তার পুত্রবধূর পিতা মৃত্যুবরণ করেন তখনই নিজ পুত্রকে বলেন যে, তোমরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী

পাকিস্তান যাও এবং সেখানে তার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। এরপর এই পুত্রবধু লিখেন যে, যখনই রাতের কোন প্রহরে আমার চোখ খুলেছে আমি সর্বদাই তাকে নামায পড়তে দেখেছি। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। যারা চিঠি লিখেছে তাদের প্রায় সবাই এটি লিখেছে যে, খিলাফতের সাথে তার গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলতেন, খিলাফতের দোয়ার বদৌলতেই কারাগারে অবস্থান করেছি এবং খিলাফতের দোয়ার বরকতেই এখানে আছি। তিনি আরো বলতেন, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিল, খিলাফতের দোয়ার কল্যাণে তার তো কোন অস্তিত্ব নেই যে, সে কোথায় গিয়েছে আর রানা সাহেব জীবন্ত নিদর্শনস্বরূপ জগতের সামনে উপস্থিত আছেন।

তাঁর এক মেয়ে আবেদা বলেন, আমাদের সন্তানদের তিনি সর্বদা একটি উপদেশ দিতেন যে, খোদা তা'লা এবং খিলাফতের সাথে সবসময় দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখবে; এতেই তোমাদের স্থায়ী জীবন নিহিত। তিনি সর্বদা কুরআন মজীদ পাঠ করার প্রতি জোর দিতেন; নিয়মিত নামায এবং তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি বলেন, আমি জীবনে তাকে কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়তে দেখি নি। তিনি আমাদের জন্য দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন; ভীষণ অতিথিপরায়ণ ছিলেন; দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখতেন। তিনি নিজ পিতামাতা ও মরহুমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ থেকেও নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সব সময় একটি পঙক্তি উঁচুস্বরে পাঠ করতে শুনেছি। সেটি হলো,

"হো ফযল তেরা ইয়া রাব্ব ইয়া কোঈ ইবতিলা হো

রাযী হ্যা হাম উসী মে জিস মে তেরী রেযা হো"

অর্থাৎ, "হে প্রভু! অনুগ্রহ বা পরীক্ষা যা-ই হোক তোমার সন্তুষ্টিতেই আমি সন্তুষ্ট"। তার মেয়ে বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের সব বোনের প্রতি খুবই খেয়াল রেখেছেন আর পুত্রবধূকে মেয়েদের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন। বাইরে থেকে যা-ই নিয়ে আসতেন অথবা ঈদের উপহার দেওয়ার সময় পুত্রবধূকে প্রথমে দিতেন এরপর আমাদের সবাইকে দিতেন। তিনি সর্বদা বলতেন, একজনের মেয়েকে ঘরে এনেছি, তার প্রতি বেশি যত্ন নিতে হবে, কেননা খোদা তা'লার কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে।

আরেক মেয়ে লিখেন, সত্যিই পরীক্ষার যে দিনগুলো তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেছেন তা তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি, ধর্মানুরাগ এবং খিলাফতের ভালোবাসায় কাটিয়েছেন। তার মুখ থেকে কোন অভিযোগ তো দূরের কথা, উফ্ শব্দও শুনি নি। ফরয নামায ও তাহাজ্জুদ নামায পড়তে কখনো বিলম্ব করেননি। আর অসুস্থতার সময়ও নামায পরিত্যাগ করেন নি। কারাগারে নির্যাতনের কারণে তার কিডনির সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আর শেষ দিকে এসে তা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এর সাথে শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য শারিরীক সমস্যাও ছিল। তিনি লিখেন, আমরা কখনোই তার পক্ষ থেকে অস্থিরতার কোন বহিঃপ্রকাশ দেখিনি। সর্বদাই তাকে শুধু আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতায় আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে শুনেছি।

তার আরেক মেয়ে লিখেন, আমাদের ব্যাপারে এতদূর চিন্তা করে রেখেছিলেন যে, তিনি বলতেন, আমার প্রায় ৮৭/৮৮ বছর বয়স হয়েছে। বলা যায় না কখন কী হয়। আমি যখন থাকব না, অর্থাৎ আমি মারা গেলে, আমার দেহ পাকিস্তানে নিয়ে যেও। সেই সাথে মেয়েদের এটাও বলেন যে, তোমাদের পাকিস্তান যাওয়ার টিকিটের টাকা আমি আলাদা করে রেখেছি, আমার জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় যেন স্বামীর দিতে তাকিয়ে থাকতে না হয়। নিজের বাবার জানাযাতে নিজের বাবার টাকায় যাবে।

এখন তো বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তার মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে সাময়িকভাবে আমানত হিসেবে দাফন করা হয়েছে। পরে যখন সুযোগ ও সুবিধা হবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্ তার মর দেহ সেখানে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।

রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ তার ভাগ্নে রানা সাব্বির সাহেব কাজ করেন। তিনি লিখেন, তিনি যখন কারাবাসে ছিলেন তখন তার সাথে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। যখনই কারাগারে তার কাছে কোন জিনিস পৌঁছানোর জন্য যেতাম তখন অনেক দুশ্চিন্তা হতো, কিন্তু তিনি প্রায়ই আমাকে ধৈর্য ও দোয়া করার জন্য বলতেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চমার্গের বুযুর্গ ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। একইভাবে তার স্ত্রীর ভাতিজি রুবিনা সাহেবা লিখেন, তিনি ১৯৮০ সন পর্যন্ত কাসরে খিলাফতে ছিলেন। আমরা যখন জলসায় যেতাম আর কখনো কখনো দু'একটি অ-আহমদী পরিবারও সাথে থাকত অর্থাৎ জলসায় আত্মীয়স্বজন ও মেহমানরা যোগ দিত, তখন আমার ফুফা তার স্ত্রীকে বলতেন, মেহমানদের খেয়াল রাখতে হবে। খাবার-দাবার ও শোওয়ার ব্যবস্থায় তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। জায়গার সংকুলান না হলে নিজে সন্তানদের নিয়ে তিনি স্টোর বা রান্নাঘরে ঘুমিয়ে পড়তেন আর অতিথিদের শোবার ঘর ও বারান্দাসহ ভালো জায়গায় ঘুমাতে দিতেন। তিনি বলতেন, তারা মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মেহমান। তাদের কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়। তার এক ভাগ্নে বলেন, আমি তার সাথে কারাগারে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। যখন তাকে খবরাখবর জিজ্ঞেস করি এবং ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই তখন অত্যন্ত উদ্দীপ্ত-উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ভাগ্নে! সর্বদা কলেমার সুরক্ষা করতে হবে। যদি তোমার প্রাণও চলে যায় তাতে কোন পরোয়া নেই। এই ভাগ্নে আরো বলেন, তখন আমার এমন মনে হয় যেন এ কথাগুলো কোন মানুষের নয় বরং ফেরেশতার আওয়াজ ছিল। তিনি অত্যন্ত সাহসী, বীর, কলেমার সুরক্ষাকারী এবং খিলাফতের প্রেমিক নির্ভিক এক আহমদী মুসলমান ছিলেন।

এরপর তিনি বলেন, বেলজিয়াম থেকে যখন লন্ডন স্থানান্তরিত হয়েছিলাম তখন তিনি বলেন, যেহেতু খিলাফতের কারণে এসেছ তাই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। যুগ খলীফার প্রতিটি কথায় লাব্বায়েক বলবে, নতুবা কোন লাভ নেই। এরপর এটিও বলেছেন যে, নিয়মিত নামায আদায় করবে এবং কোন বিষয়ে বিচলিত না হয়ে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সকাশে অবনত হবে। মিথ্যাবাদী ও কপটাচারীর প্রতি খুবই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। নিজ ডিউটি সম্পর্কে অনেক চিন্তিত থাকতেন। কখনো স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হলে ঘরের সদস্যরা বলত, আজকে বিশ্রাম নিন। তিনি বলতেন যে, না, আমি সুস্থ আছি। এগুলো আমার বোনাসের দিন। বৃদ্ধ বয়সে খিদমতের সুযোগ পাচ্ছি, তাই কাজে লাগাতে দাও।

জেলখানায় রানা সাহেবের সঙ্গী ইলিয়াস মুনীর সাহেব লিখেন, রানা সাহেবের সাথে আমার জীবনের একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে। আর এখন শেষ বিদায়ের সময় তাকে দেখতে পারছি না, তাই মন চরম অস্থির ও বিচলিত হয়ে আছে। রানা সাহেবের সাথে ১০ বছর জেলখানায় অতিবাহিত হয়েছে। একদিনও আমি তাকে মনোবল হারাতে দেখিনি। এমনকি যখন সামরিক শাসকের পক্ষ থেকে তাকে অন্যায় ও পাশবিক মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনানো হয় তখনও তিনি তা হাসি মুখে শুনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন। তার পরিবার বেশ বড় ছিল এবং সব সন্তানই অল্পবয়স্ক ছিল। জীবনোপকরণেরও বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা ছিল, ধর্মসেবার প্রেরণা ছিল আর জামা'তের সম্মানের চিন্তা ছিল। কখনো উৎকণ্ঠিত হলে শুধু এতটুকু বলতেন যে, এদের ষড়যন্ত্র খুবই ভয়ানক, আল্লাহ্ তা'লাই আছেন যিনি এদের হাত থেকে নিরাপদ রাখবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লাই তার সব কাজ সমাধা করেছেন, বন্দি থাকাকালেই তার মেয়েদের বিয়েও হয়ে যায়।

ঘটনার উল্লেখ করে ইলিয়াস মুনীর সাহেব সংক্ষেপে লিখেন যে, দাঙ্গাবাজরা যখন মসজিদের ওপর আক্রমণ করে আর 'পবিত্র কলেমা' এবং (কুরআনের) আয়াত ও হাদীসের অসম্মান করতে আরম্ভ করে সেই দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না। তখন তাকে প্রথমবার বজ্রকণ্ঠে ধমক দিতে শুনেছিলাম, অর্থাৎ রানা সাহেব বলেছিলেন, তোমরা কলেমা মুছে ফেলার কে? তিনি বলেন, এর পূর্বে আমি তাকে (অর্থাৎ রানা সাহেবকে) কখনো উর্দূ বলতে শুনিনি, কিন্তু সে সময় তিনি উর্দূ তে কথা বলেন এবং বজ্রকণ্ঠে বলেন। আর একাই ত্রিশ-চল্লিশজন আক্রমণকারীকে প্রথমে মসজিদের কোণায় লুকাতে এবং এরপর পালাতে বাধ্য করেন। এরপর লিখেন, তিনি পরম বীরত্বের সাথে কেবল এ কাজই করেন নি বরং পুলিশ অফিসার যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, গুলি কে ছুড়েছিল, তখন তিনি একমুহূর্ত বিলম্ব না করে সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন, আমি করেছি। এরপর তার ওপর বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন চালানো হয় এবং

(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়...)

যাকাত এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য, এটি প্রদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন

পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হয়েছে। এই আশিসময় মাসে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র উক্তি অনুসারে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেননা, এই পবিত্র মাসেই মোমেনগণ সমধিক হারে শরিয়ত বিধান সম্মত আদেশাবলী মেনে চলার সুযোগ পায়, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করে অশেষ রহমত ও বরকতের অংশীদার হয়। এই পবিত্র মাসে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কেবল অনেক বেশি ইবাদতই করতেন না, বরং প্রচুর পরিমাণে সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতেন। অতএব আমাদের প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের কর্তব্য হল আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে কেবল ইবাদতের বিষয়েই দ্রুত হব না, বরং আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী হব।

জামাতের সদস্যগণ নিশ্চয় অবগত আছেন যে কুরআন করীমে নামাযের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যাকাত দানের জন্য উপযুক্ত প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালনের প্রতি মনোযোগী হোন।

যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভগুলির অন্যতম যা যাকাত প্রদানের জন্য যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

সুতরাং হে লোক সকল! যাহারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহতালাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫)

গয়নার যাকাত সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

যে গয়না ব্যবহৃত হয় এবং কখনও কখনও গরিব মহিলাদেরকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়, এ সম্পর্কে কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন সেগুলির যাকাত নেই। আর যে গয়না পরা হয়, কিন্তু অন্যদেরকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় না, সেগুলির যাকাত দেওয়াই শ্রেয়, কেননা সেটি নিজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা পরিবারে এই রীতিই মেনে চলি এবং প্রতি বছরের পর নিজেদের বর্তমান গয়নার যাকাত দিই এবং যে গয়না অর্থ হিসেবে সঞ্চিত থাকে সেগুলির যাকাত সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই।

(আল হাকাম, ১৭ ই নভেম্বর, ১৯০৫)

সৈয়্যাদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে এই কর যেটিকে যাকাত বলা হয়, তা আয়ের উপর দেওয়া হয় না। বরং পুঁজি ও লাভ সব মিলিয়ে তার উপর ধার্য করা হয়। এভাবে আড়াই শতাংশ অনেক সময় লাভের পঞ্চাশ শতাংশ দাঁড়ায়।

(আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড,পৃ:৩০৬)

গয়না এবং নগদ টাকার উপর যাকাতের হার সম্পর্কে সৈয়্যাদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

" রূপার জন্য রূপা অনুযায়ী এবং স্বর্ণের জন্য স্বর্ণ অনুযায়ী হার ধার্য হবে যা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে তিনি স্বয়ং প্রচলন করেছিলেন। আর নগদ অর্থের ক্ষেত্রে যাকাতের হার ধার্য করার প্রসঙ্গে বলতে হবে যে বর্তমান যুগে অধিকাংশ পৃথিবী স্বর্ণকেই মুদ্রামান হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছে। অতএব, নগদ অর্থের যাকাত নির্ধারণে স্বর্ণকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হবে।

(মজলিসে ইফতা-র নামে হুযুর আনোয়ারের পত্র)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

আঁ হযরত (সা.) রুপোর জন্য ৫২.৫ ভুরি এবং স্বর্ণের জন্য ৭.৫ ভুরি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

* যার কাছে সাড়ে বায়ান্ন ভুরি (৬১২ গ্রাম) রুপা এক বছর থেকে সঞ্চিত রয়েছে, তাকে এর থেকে ১/৪০ ভাগ অর্থ আড়াই শতাংশ যাকাত দেওয়া আবশ্যক।

* অনুরূপভাবে সাড়ে সাত ভুরি (৮৭ গ্রাম) সোনা বা সমপরিমাণ নগদ অর্থ এক বছর থেকে সঞ্চিত থাকলে তার উপরও নির্ধারিত ১/৪০ বা আড়াই শতাংশ হারে যাকাত দেওয়া আবশ্যক।

* যাকাতের সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই কেন্দ্রে পাঠানো আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার তৌফিক দান করুন এবং জামাতের সমস্ত সদস্যের প্রাণ ও সম্পদে বরকত দান করুন। (নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

(২ পতার শেষাংশ)

তিনি 'সামাদ' তিনি নিজে থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছেন, তিনি কোন বিষয়ের মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টি জগতই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। একস্থানে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد:17)

(আর রাআদ, আয়াত: ১৭)

তুমি বল, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' তুমি বল, 'আল্লাহ'। (পুনরায় তাহাদিগকে) বল, তবুও কি তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া এমন সাহায্যকারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজেদের জন্য না উপকারের ক্ষমতা রাখে এবং না অপকারের।'? তুমি (আবার) বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মাণ কি সমান হইতে পারে'? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি আল্লাহর সঙ্গে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে'? তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক অদ্বিতীয়, মহা প্রতাপান্বিত।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ (القصص:72)

অর্থ: তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি- আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বুদ আছে যে তোমাদের নিকট আলো আনিয়া দিবে? তবু কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?'

(সূরা আল কাসাস, আয়াত: ৭২)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (القصص:73)

তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি- আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বুদ আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রি আনিয়া দিবে যাহাতে তোমরা স্বস্তি লাভ করিতে পার? তবুও কি তোমরা দেখিতেছ না?'

(সূরা আল কাসাস, আয়াত: ৭৩)

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (القصص:74)

বস্তত ইহা তাঁহারই রহমত হইতে যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত্র ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার ফযলের অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার। (সূরা আল কাসাস, আয়াত: ৭৪)

অতঃপর তিনি বলেন- لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

অর্থাৎ যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁহার এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রাচুর্যশালী অতীব প্রশংসনীয়।

(সূরা হজ্জ, আয়াত:৬৫)

(খুতবার শেষাংশ ...)

এই মর্মে জামা'তের কর্মকর্তাদের নাম নিতে বাধ্য করার অপচেষ্টা করা হয় যে, তাদের কথায় এ কাজ করেছি। কিন্তু কুর্নিশ সেই বীর পুরুষকে, যিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনার ওপর তিল পরিমাণও আঁচ আসতে দেন নি আর বাস্তবতাও তা-ই ছিল; জামা'তের কর্মকর্তাদের এটি জানা ছিল না যে, তার কাছে ব্যক্তিগত বন্দুক রয়েছে। এছাড়া আদালত, তাও আবার বিশেষ সামরিক আদালতের কোন চাপের সামনে নতি স্বীকার করেন নি। মৌখিক এবং লিখিতভাবে স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে স্পষ্টভাষায় বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে একথা স্বীকার করেন যে, তিনি নিজেই গুলি ছুঁড়েছিলেন আর তার এই বীরত্ব, সাহসিকতা, স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং জামা'তের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রেরণার কারণেই অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলকাম করেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি খিলাফতের সাথে থেকে সেবা করারও তৌফিক লাভ করেন।

এরপর ইলিয়াস মুনীর সাহেব আরো লিখেন, বন্দি থাকাকালে তার পিতার কাছে যখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র লিখিত খুতবা আসতো আর তিনি তা আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন তখন রানা সাহেব আমাকে খুতবা পড়ে শোনানোর জন্য তার সাথে বসাতেন আর যতদিন আমরা মৃত্যুদণ্ডের কালকুঠুরিতে ছিলাম, তাদেরকে পৃথক পৃথক সেলে রাখা হতো। তিনি বলেন, আমাদেরকে যখনই কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হতো, উভয়কে একত্রিত করার জন্য সেল খোলা হতো, তখন সেই সময়টুকু শুধুমাত্র খুতবা শোনার জন্য উৎসর্গ করতেন আর যত্ন সহকারে পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে খুতবা শুনতেন।

এরপর বলেন, যেসব নামায বাজামাত পড়া সম্ভব হতো তা পুরো প্রস্তুতি ও সচেতনতার সাথে পড়তেন। বরং অনেক সময় জেলে থাকা অন্যান্য আহমদীদেরও ডেকে আনতেন। রমজানের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তিনি বলেন, মে, জুন ও জুলাই মাসের কঠিন সময়ের রোযা আমাদের জেলে থাকাকালে এসেছিল আর মোহতরম রানা সাহেব নিজের বৃদ্ধ বয়স এবং জেলখানার বিভিন্ন কাঠিন্য সত্ত্বেও সব রোযা রাখতেন। ইলিয়াস মুনীর সাহেব বলেন, খুবই অসাধারণ সাহস ও মনোবল তিনি প্রদর্শন করেছেন আর সানন্দে সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। এমনকি তাকে যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হয় তখনও তিনি পরম সাহসিকতার সাথে সময় পার করেছেন আর তার বীরত্ব এমন ছিল যে, অ-আহমদীরাও তা অনুভব করেছে। তিনি বলেন, দেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়ার পর জেলের একজন ওয়ার্ডেন রানা নাঈম উদ্দীন সাহেবের কাছে আসে এবং বলে, বুজুর্গ! দেখুন, এই মির্যাঈরা (অর্থাৎ আহমদীরা) বড়ই অদ্ভুত মানুষ। তারা মৃত্যুদণ্ডের দিন-ক্ষণ অবগত হয়েছে এবং নিজেদের অন্তিম পরিণতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, কিন্তু তাদের চেহারায় কোন ছাপ নেই, এতটুকু তারতম্য ঘটে নি আর সামান্য পরিমাণও ভেঙে পড়ে নি। যাহোক সে কথা দীর্ঘায়িত করতে থাকে। রানা সাহেব বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, সে জানে না আমি কে? অতএব সে যখন তার কথা শেষ করে তখন রানা সাহেব জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি আমার চেহারায় কোন ছাপ দেখতে পেয়েছ কি? সে উত্তর দেয় যে, না। তখন রানা সাহেবের এই কথায় সে কেঁপে উঠে যে, আমিও আহমদী এবং তাদেরই একজন।

পরিশেষে একটি পত্র পাঠ করছি যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রানা নঈম উদ্দীন সাহেবকে লিখেছিলেন। সেই পত্রের একটি অংশ হলো, আপনার নিষ্ঠাপূর্ণ পত্রাবলী পেয়েছি। উন্নত ঈমানের সুদৃঢ় যে পাহাড়ে আপনি দণ্ডায়মান রয়েছেন তা গর্বের বিষয়। আল্লাহ্ ওয়ালাদের উন্নত মান অর্জন করার পূর্বে এরূপ কঠিন পথ পাড়ি দিতেই হয়। আপনাদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়। বৃক্ষের পরিচয় ফলে। আপনারাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৃক্ষের সবুজ-সতেজ শাখা এবং সুমিষ্ট ফল। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের বিনষ্ট করবেন না। জামা'ত দোয়া করে যাচ্ছে। আমার দোয়াও আপনাদের সাথে রয়েছে। আশা করি আপনি আমার সাম্প্রতিক নযমও শুনে থাকবেন, তাতে আপনি ও আপনার মতো নিষ্ঠাবানদের জন্যই আন্তরিক বাণী ও সালাম রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করুন এবং শত্রুদের থাবা থেকে মুক্তি দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথী হোন– এই চিঠি হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) রানা সাহেবকে লিখেছিলেন।

মুবারক সিদ্দীকি সাহেব বলেন, একবার আমি তার কাছে তার বন্দি জীবনের কথা জিজ্ঞেস করি আর জেলখানার কষ্টের কথা জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে বলেন, আমাদের তথা আহমদীদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে, রসূলের খাতিরে এবং যুগ-খলীফার আনুগত্যের জন্য নিবেদিত। তাই আমার কাছে কখনো কোন কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না। আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। নিশ্চিতভাবে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও যখনই তাঁর খবরাখবর জিজ্ঞেস করতাম তিনি আলহামদুলিল্লাহ্-ই বলতেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে পরের দিনই চলে আসতেন আর বলতেন আমি পুরোপুরি সুস্থ; বরং একইসাথে আমাকেও দোয়া দিতেন। যেমনটি আমি বলেছি, এক ডাক্তার বলেন, এ রোগে আক্রান্ত রোগী, যাদের পা-ও ফোলা থাকে, তারা ঘরের বাহিরে যেতে পারে না কিন্তু তিনি এসে ডিউটিতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এতে ডাক্তাররা বড়ই আশ্চর্য হতো। ডাক্তাররা হয়ত আশ্চর্য হতো, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, তার মাঝে এক সুগভীর প্রেরণা ছিল, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ছিল, খেলাফতের সান্নিধ্যে থাকার ব্যাকুলতা ছিল, যা তাকে মসজিদে টেনে আনতো আর ডিউটিতে নিয়ে আসতো। আমি তার চেহারায় সর্বদা পরম প্রশান্তি লক্ষ্য করেছি এবং খিলাফতের জন্য ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে পরকালে স্নেহ ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং নিজ প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন।

আমি তাকে শৈশব থেকে চিনি। যেমনটি বলা হয়েছে, তিনি যখন নাখলা-জাবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে ছিলেন, তখন তিনি সাথে যেতেন, আমরাও গ্রীষ্মকালে কিছু দিনের জন্য সেখানে যেতাম। তখনও আমাদের সাথে তার অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল। আর খলীফা হওয়ার পর আমার সাথে এতে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। যেমনটি খিলাফতের প্রতি তার বিশ্বস্ততার ঘটনাবলী এবং নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ-অনুভূতির কথা আমরা শুনলাম, তা সর্বদা তার মাঝে পরিলক্ষিত হতো। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও সর্বদা নিষ্ঠার সাথে নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন। পরিস্থিতির কারণে তার জানাযা পড়া সম্ভব হয় নি, আমি পড়তে পারি নি। সরকারী বিধিনিষেধও ছিল, এছাড়া আরো কিছু নিষেধাজ্ঞাও ছিল। আমাদের এই আক্ষেপও আছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী কোন সময় আমি তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

সবশেষে আমি পুনরায় বর্তমান মহামারির প্রেক্ষিতে এটিও বলতে চাই যে, আমাদের কতিপয় আহমদী রোগী রয়েছেন। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন। আর আমাদেরকেও নিজ সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করার এবং হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানের তৌফিক দান করুন আর অচিরেই আমাদের মাঝ থেকে এই বিপদ দূর করুন। আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকেও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন, তারাও যেন এক খোদাকে চিনতে পারে, খোদা তা'লার ইবাদতকারী হয়, তৌহীদকে বুঝতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি কৃপা করুন। (আমিন)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্থ এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

(অবশিষ্ট ভাষণ....) হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কাজেই নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে, ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন করতে আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং অন্যান্য পবিত্র নমুনা তুলে ধরতে হবে। আমি কালকেও খুতবায় এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করেছিলাম। পাঁচ বেলা মসজিদে গিয়ে বা-জামাত নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের জন্য বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি আছে। আর সওয়াব বা প্রতিদানও পুরুষদের সমান, যারা মসজিদে গিয়ে মসজিদের গিয়ে নামায পড়লে পেয়ে থাকেন। কাজেই এই সুবিধাকেও যদি কাজে না লাগান, তবে এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে! যুগ ইমামকে মান্যকারী আহমদী মহিলারা যদি যুগের কলহ ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে আল্লাহ তা'লার ইবাদতকারী হতে হবে এবং সঠিক অর্থে তাঁর বান্দা হতে হবে। ইবাদতকারী হওয়ার পরই অন্যান্য পুণ্য করার তৌফিক লাভ হবে এবং এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে যে 'আমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্যকারী হতে হবে।' তবেই 'কানেতাত'-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মহিলাদেরকে পরিবার এবং স্বামীর তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছে। তাদের অনুপস্থিতিতে পরিবার এবং সন্তানসন্ততির তত্ত্বাবধান এবং নিরাপত্তার বিধান করা স্ত্রীদের দায়িত্ব। কাজেই সন্তানের তরবীয়তের দায়িত্ব স্ত্রীদের উপর সব থেকে বেশি দেওয়া হয়েছে, স্বামী যদি বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে, বাড়িতে না থাকে তবে স্ত্রী তাদের তত্ত্বাবধায়ক। শিশুরা স্কুল থেকে ফেরার সময় বাড়িতে মায়েদের উপস্থিতি আবশ্যক, যাতে তাদের খাওয়াদাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং স্কুলের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এছাড়াও তরবীয়ত সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে সেগুলিও তাদেরকে বলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কাজেই আহমদী মায়েদের এখন চেষ্টা করা উচিত সন্তানের মনোস্তত্ত্ব বুঝে এখানকার পরিবেশের প্রভাব উপলব্ধি করে তরবীয়তের সময় তাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্যে তারতম্য স্পষ্ট করে দেওয়া। ইদানিং এখানে স্বাধীনতার নামে শৈশব থেকেই এমন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কই নেই এবং সাবালকত্ব অর্জনের পূর্বে যা উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়, কিন্তু তবুও এরা শেখাচ্ছে। জ্ঞানের আলোর নামে এই সব কিছু শেখানো হচ্ছে। জ্ঞানের আলোর নামে বাচ্চাদেরকে এরা চারিত্রিক ও নৈতিক অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এরফলে বাচ্চারা নৈতিক ও চারিত্রিক অন্ধকারে ডুবেও যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মায়েদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। নিজেদের পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এই সব অনর্থক বিষয়গুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রথমত নিজেরা তথ্য সংগ্রহ করুন, আর বাচ্চারা স্কুল থেকে শিখে আসার পর সে সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করে তবে নিঃসংকোচে অবাধ সম্পর্ক তৈরী সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিন। তাদেরকে বলুন যে এগুলি খারাপ কাজ, আর এসব করার বয়স তোমাদের নয়। এভাবে আমরা নিজেদের সন্তানদেরকে রক্ষা করতে পারি, তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারি। অন্যথায় এই বস্তবাদি পরিবেশ আমাদের বংশধরদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দিবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই প্রত্যেক আহমদীকে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক আহমদী মহিলাকে নিজেদের দৃষ্টান্ত এবং দোয়ার মাধ্যমে এমন উৎকৃষ্ট মানের তরবীয়ত করতে হবে যাতে বলা যায় যে এই মায়েরা এমন সত্তা যারা আল্লাহ্ তা'লা কৃপা অন্বেষণ করে নিজেদের সন্তানের মাধ্যমে জামাতকে এক মূল্যবান সম্পদ দান করছে। এই সন্তানেরা আপনাদের কাছে জামাতের গচ্ছিত সম্পদ আর তরবীয়তের কারণে এরা খোদার প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এরা সেই সব মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রীতিভাজন হয়েছে, যারা নিজেদের শুভবুদ্ধির কারণে জগতের কলুষতার দিকে দৃষ্টিও দেয় না। টিভি এবং ইন্টারনেটের বাজে অনুষ্ঠানের প্রতি এদের কোনও আগ্রহ নেই। এদের একমাত্র আগ্রহের বিষয় হল খোদা তা'লার কৃপা অন্বেষণ করা। এই জগতের মানুষ যেন বলে যে এরা সেই সব শিশু যাদের আগ্রহ বাজে বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র নেই, যারা সময় অপচয় করে না কিম্বা ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায় না। নষ্ট ছেলেদের সঙ্গে নেশাদ্রব্য ব্যবহার করে না। কেবল খোদার কৃপা অন্বেষণ করে। তাদের উদ্বেগ কেবল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই অঙ্গীকারের অংশ হওয়া নিয়ে যাতে তিনি বলেছেন, ' আমার মান্যকারীরা জ্ঞান ও মারেফাতে অগ্রগণ্য হবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আর তাদের ব্যগ্রতা হল উন্নতি করে পৃথিবীকে পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে দাজ্জালী ফিতনাকে রক্ষা করার। অতএব এমন ধনভান্ডার এবং সত্তা সৃষ্টিকারী হন। এমন মোমেনসুলভ স্ত্রী ও মায়ের গুণ বিকশিত করুন যাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-বলেছেন, এরা হল সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে মায়েদের একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে মেয়েদের তরবীয়তে জন্য তাদেরকে নিজেদেরও নমুনা দেখাতে হবে। বিশেষ করে নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং পর্দার বিষয়ে সচেতন হতে হবে। লজ্জাশীলতা মহিলাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেয়েদেরকে বলুন যে এই তথাকথিত উন্নত সমাজ তোমাদের নিজেদের সম্মান ও লজ্জাশীলতা রক্ষার নিরাপত্তা দেয় না। শৈশব থেকেই , পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকেই তাদেরকে বলতে হবে যে, এই সমাজ তোমাদের আব্রু রক্ষা করে না। লজ্জাশীলতা রক্ষা করা যায় একমাত্র খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে পর্দার আদেশ দিয়েছেন এবং লজ্জাশীলতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। সব সময় মেয়েদেরকে এই শিক্ষা দিবেন যে আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশকে সব সময় দৃষ্টিপটে রেখো। এ বিষয়ে কোনও প্রকার হীনমন্যতায় গ্রস্ত হওয়ার দরকার নেই, মনের মধ্যে কোনও হীনমন্যতা তৈরী হতে দিলে হবে না। যদি মায়েরা নিজেরা পর্দার হিফাযত করে এবং মেয়েদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তবে নিঃসন্দেহে মেয়েদের উপরও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক শিক্ষিত মেয়েরা মনে করে যে আমাদের মায়েরা পুরোনো যুগের। তারা কি জানে যে এই যুগে চলতে গেলে পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা করা প্রয়োজন? এমনকি কোনও কোনও স্থানে যদি পর্দা নাও করি বা লজ্জাশীলতা অবলম্বন না করি তবে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাদের একথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে যারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ থেকে দূরে সরে যায় তারা নিজের এবং নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করবে। কাজেই কোনও হীনমন্যতায় না ভুগে একজন আহমদী মেয়ে কিম্বা মহিলাকে সেই পোশাক অভিসম্পাত দিয়ে ত্যাগ করা উচিত যাতে লজ্জাশীলতার অভাব রয়েছে, যে পোশাক আল্লাহ্ তা'লার আদেশকে অমান্য করে। কেউ যদি অজুহাত খাড়া করে যে কাজের জন্য বিশেষ ধরণের পোশাক পরতে হয় যা ব্লাউয ও জিন্স ছাড়া কিছুই নয়, আর স্কার্ফও নেওয়া যায় না বা লম্বা কোট পরা যাবে না, তবে এমন কাজ থেকে আমাদের মেয়েদের দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়, যা উন্মুক্ত পোশাকের দিকে নিয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি আল্লাহ্ তা'লার অভিভাবক হওয়ার উপর ঈমান থাকে এবং পুণ্যবতী মহিলা হওয়ার চেষ্টা করেন তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই পুণ্যবতীর অভিভাবকও হবেন। আজ যদি পর্দা থেকে আপনারা স্বাধীন হয়ে যান তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম আরও বেশি বেপরোয়া ও স্বাধীন হয়ে উঠবে এবং ক্রমশ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাবে। হযরত মসীহ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

মওউদ (আ.) -এর এই বাণীকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখবেন, ‘ ইউরোপের মত পর্দাহীনতার উপর মানুষ বেশি জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি কখনওই উচিত নয়। এটিই মহিলাদের স্বাধীনতা, ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার মূলে।’ এটিই প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে থাকে এবং এটিই ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ধর্মের বিধিনিষেধ থেকে দূরে নিয়ে যায়। আর এর মূল কারণ হল এই স্বাধীনতা। কাজেই অনেক ভাবনা চিন্তা করে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে যদি আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের নির্দেশ এবং এই যুগের ইমাম ও ন্যায় বিচারকের কথা মনোযোগ সহকারে মেনে না চল, তবে নিজেদের ধর্ম হারিয়ে ফেলবে। তখন এমন দাবি করা অনুচিত হবে যে আমরা মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি। এই পরিবেশে লজ্জা পাওয়ার পরিবর্তে এই বস্তবাদিদেরকে খোলাখুলি বলুন যে পর্দা আমাদের ধর্মীয় বিষয় আর তোমরা আমাদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করো না। এখানকার শিক্ষিত আহমদী যুবতীরা পত্র-পত্রিকায় এবিষয়ে লিখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চললে ধর্মজগত এবং ইহজগতে সম্মান লাভ করবেন। কাজেই আপনারা আত্মসমীক্ষা করুন। কেবল মসজিদে এবং জলসায় আসার জন্যই যেন আপনাদের লজ্জাশীল পরিধান না থাকে, বরং এটি আপনাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। যেখানেই থাকুন, আপনাদের পোশাক পরিচ্ছদ যেন লজ্জাশীল হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর এই কথাটি সব সময় স্মরণ রাখবেন যে তাকওয়া অবলম্বন কর, জগত এবং এর আড়ম্বরের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট হয়ো না। চেষ্টা কর যেন তোমরা যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ কর।” তিনি বলেন,, “ খোদা নির্দেশিত নামায , যাকাত ইত্যাদি আবশ্যকীয় আদেশের ক্ষেত্রে অবহেলা করো না। নিজেদের দায়িত্ব এমন উৎকৃষ্ট পন্থায় পালন কর যাতে খোদার নিকট পুণ্যবতী ও কানেতাত হিসেবে গণ্য হও।”

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ করুন প্রত্যেক আহমদী মহিলা এবং কিশোরী যেন ধর্মকে জাগতিকতার উপর অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর আদেশাবলী ও বাণীর মান্য করে নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধর্মের রক্ষক এবং খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের ইমামকে মান্য করার যে সম্মান আপনাদেরকে দান করেছেন সেটিকে আপনারা যেন সব সময় মূল্য দেন এবং জাগতিকতার মধ্যে ডুবে গিয়ে তার থেকে দূরে না সরে যান।

সব শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করান।

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পারে পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও শান্তি বর্ষিত হোক। সর্ব প্রথম আমি সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত এবং খাঁটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিক কিছু বছরে মুষ্টিমেয় তথাকথিত মুসলমান সংগঠনের পাশবিক ও বর্বর অত্যাচার ফ্রান্স সহ বিভিন্ন দেশের অশেষ দুঃখ-কষ্ট পৌছনোর কারণ হয়েছে। এই ধরণের আক্রমণের তীব্র নিন্দাই করা যায় আর আমাদের দোয়া, সহানুভুতি সব সময় অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং ইসলাম শান্তি, ভালবাসা, সহনশীলতা এবং মীমাংসার ধর্ম। ইসলামের আভিধানিক অর্থই ‘শান্তি ও নিরাপত্তা।’ কাজেই একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তিই যে নিজেও শান্তিপ্রিয় এবং পৃথিবীতেও শান্তি ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় রত থাকে। মুসলমানদেরকে একেবারেই প্রাথমিক স্তরে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যখন কারো সঙ্গে আলাপ কর , সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, তাকে ‘আসসালামো আলাইকুম’ বল, যার অর্থই হল আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আলাপচারিতার এই ইসলামী রীতি শুভেচ্ছার প্রতীক যা অপরকে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা দেয়। বরং অনেক অমুসলিমকেও দেখেছি, যাদের মুসলমান বন্ধুবান্ধব কিম্বা পরিচিত রয়েছেন, তারাও ইসলামী রীতি মেনে আলাপের সময় সালাম করে। যাইহোক এটা সম্ভব নয় যে আমাদের ধর্ম একদিকে প্রত্যেকের প্রতি শান্তি ও সৌহার্দের বার্তা দেওয়ার উপদেশ দিবে, আবার অপরদিকে আমাদের এই দাবিও থাকবে যে আমরা মানুষের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের অধিকার আত্মসাৎ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে অস্ত্র ধারণ করব। ইসলামী শিক্ষায় এমন স্ববিরোধ থাকা সম্ভব নয়। কাজেই স্পষ্ট থাকে যে, সকল প্রকারের চরমপন্থা এবং অন্যায় অত্যাচার ইসলামী শিক্ষার চরম পরিপন্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামকে যথার্থরূপে প্রণিধান করতে গেলে এর প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর যুগটিকে ভালভাবে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবী হওয়ার দাবি করেন, তখন তিনি এবং তাঁর সাহাবাগণ ঘোর বিরোধিতা এবং পাশবিক অত্যাচারের শিকার হন। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে কেবল কয়েকজনই এমন ছিলেন যারা সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী পরিবারের ছিলেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী ছিল অভাবপীড়িত এবং ক্রীতদাস। মক্কার কাফেররা ভয় দেখানোর জন্য তাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও বর্বর নির্যাতন করত। কিন্তু রসুল করীম (সা.)-এর মহান ধৈর্য ও উদ্যমশীলতা সহকারে এই অমানবিক আচরণ ও পাষাণ-হৃদয় অন্যায়কে সহন করতে থাকেন এবং নিজ অনুসারীদেরকেও এরই উপদেশ দিতেন। যেমন একবার রসূল করীম (সা.) কাফেররা এক মুসলিম দম্পতি এবং তাদের সন্তানকে প্রহার করছে, তাদের উপর নির্যাতন করছে। এই চরম অত্যাচার ও বর্বরতা সত্ত্বেও রসূল করীম (সা.) তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং অবিচল থাকার পাশাপাশি সহন করার উপদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে না বললেন প্রতিশোধ নিতে, না আহ্বান করলেন অন্যান্য মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, বরং তিনি নিজ সাহাবা (রা.) কে নির্দেশ দিলেন যদি প্রাণও যায়, তবুও শান্তি বজায় রাখতে। তিনি তাদেরকে জোর দিয়ে একথা বললেন যে তারা পরকালে এর প্রতিদান পাবেন আল্লাহ্ তা'লার কাছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রসুল করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ কয়েকবছর পর্যন্ত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মদীনায় হিজরত করেন, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারতেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসাবাস করতে পারতেন। কিন্তু হিজরত করার কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কার কুফফাররা মুসলমানদের পিছু নিয়ে তাদের নতুন দেশেও পৌঁছে যায় এবং সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'লা প্রথম বার মুসলমানদেরকে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের অনুমতি দান করেন। এই অনুমতির উল্লেখ সূরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে রয়েছে। এই আয়াতদুটিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যুদ্ধ করার অনুমতি এই কারণে দেওয়া হয়েছে যে লোকেরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছে, আর এরা কেবল ইসলামকেই নয়, বরং ধর্মকেই পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চাইছিল। কুরআন করীম বর্ণনা করে যে যদি মুসলমানদের এদেরকে প্রতিহত করার অনুমতি না দেওয়া হত, তবে কোনও সীনাগগ, গির্জা, মন্দির কিম্বা মসজিদ এবং কোনও ধর্মের কোনও উপাসনাগার অক্ষত থাকত না। কাজেই রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণকে বাধ্য হয়েই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত মানুষদের অধিকার রক্ষা করা। এর উদ্দেশ্য ছিল এবিষয়ে আশ্বস্ত করা যে খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও মতবাদের মানুষরা যেন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে নিজেদের ইচ্ছেমত ইবাদত করার অধিকার লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি অভিযোগ করা হয় যে যদি ইসলাম মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক নিজেদের শিক্ষা প্রসারের এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্থ এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** Weekly **BADAR** Qadian
কাদিয়ান

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 21 May , 2020 Issue No.21

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং অন্যান্য ধর্মকে ধ্বংস করার অনুমতি দিত তবে কুরআন করীম কেন একথা এমন খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করছে যে অন্যান্য ধর্মকে রক্ষা করা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার রক্ষা করা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য। বস্তুত, প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় স্বাধীনতার স্থায়ী নীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এই স্বাধীনতাই হল ইসলামী ধর্মমতের মূল ভিত্তি যা চিরতরে কুরআন করীমে সংরক্ষিত হয়ে আছে। কুরআন করীমের সূরা বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা চূড়ান্ত নীতি ঘোষণা করে বলেন, ধর্মে কোনও বলপ্রয়োগ নেই। স্বাধীন চিন্তাধারা, স্বাধীন ধর্ম এবং স্বাধীন চেতনার পক্ষে এটি এক স্পষ্ট বয়ান যাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের প্রবর্তক আঁ হযরত (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে কখনও অমুসলিমদের অধিকার হরণ করা হয়নি, আর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে কিম্বা নিজেদের ধর্মীয় প্রথা ও ধর্মমত ত্যাগ করতে বাধ্যও করা হয় নি। আঁ হযরত (সা.) আজীবন শান্তি, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্মান ও শ্রদ্ধার অভিলাষী ছিলেন। যেমন আঁ হযরত (সা.) মদিনায় হিজরতের পর ইহুদীদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। যে চুক্তি অনুসারে একটি সম্মিলিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে যার প্রধান হিসেবে আঁ হযরত (সা.)-কে নির্বাচিত করা হয়। চুক্তির শর্তানুসারে মুসলমান এবং ইহুদীরা শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং বিশ্বস্ত নাগরিক হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে এবং কোনও কষ্ট ও বিধিনিষেধ ছাড়া নিজের ধর্মমত মেনে চলার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) কখনও এই চুক্তি উল্লঙ্ঘন করেন নি। অথচ অপরদিকে অনেকবার অমুসলিমরা এই চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে পূর্ব নির্ধারিত আইন অনুসারে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম কখনওই নিজ অনুসারীদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজ ধর্মমত প্রসারের অনুমতি দেয় নি। আর কোনও মুসলমান দেশ বা নেতাকেও এই ঘোষণা করার অনুমতি দেয় নি যে এখানে কেবল মুসলিমদের থাকার অনুমতি রয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, মদিনা চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক জাতি নিজেদের রীতি ও প্রথা এবং ধর্মমত অনুশীলন করার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। এই সমাজ এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর ঐক্যবদ্ধ ছিল প্রত্যেকে ধর্মমত নির্বিশেষে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করবে এবং দেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে যা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিপদ হতে পারে। এই কারণে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ভ্রান্তিমূলক অপকর্মের দোষ ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার উপর চাপিয়ে দেওয়া নিতান্তই ন্যায় বিবর্জিত নীতি। চরমপন্থী এই সব মানুষ ও সংগঠনগুলি, যাদের ব্যক্তিস্বার্থ জড়িয়ে আছে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে, তাদের ইসলামের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তারা অবশ্য নিজেদের ঘৃণাপূর্ণ কার্যকলাপকে ইসলামের নামেই বৈধতা দেয়, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল কুরআন করীম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সুনাম হানিই করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সেই উজ্জ্বল শিক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ যে অনুসারে মুসলমানদের উচিত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও সুযোগ হাতছাড়া না করা। যেমন কুরআন করীমের সূরা যুখরুফ-রে ৮৯ এবং ৯০ নং আয়াতে আঁ হযরত (সা.)-এর সেই বেদনাতুর ও অশ্রুবিগলিত দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে তিনি খোদার কাছে মিনতি করছেন, যে ভালবাসাপূর্ণ ও সত্য শিক্ষা তিনি মানুষের কাছে উপস্থাপন করছেন তা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে তাদেরকে ক্ষমা করার এবং শান্তির বার্তা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'আমানা- শব্দের অর্থ হল ঈমান আনা এবং শান্তির প্রসার করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার এবং বাকি সব কিছু আল্লাহ্ তা'লার উপর ছেড়ে দেওয়ার এবং যারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের প্রতিও অবিরাম শান্তি পৌঁছে দেওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। কুরআন করীম কোনও একটি স্থানেও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর এবং শক্তি প্রয়োগের শিক্ষা দেয় নি। বরং মুসলমানদেরকে সহন করার এবং ধৈর্য অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছে। কাজেই বর্তমান যুগের তথাকথিত মুসলমান নেতা বা ইসলামী দেশগুলি যে চরমপন্থা এবং উন্মাদনা প্রদর্শন করছে, সেগুলির দোষ তাদের নিজেদের উপরই বর্তায়। তাদের যে সব ছলকপটতা এবং গর্হিত আচরণের কারণে পৃথিবীর শান্তি ও সৌহার্দ ধ্বংস হচ্ছে, সেগুলিকে কোনও ক্রমেই বৈধ আখ্যা দেওয়া যায় না, আর সেগুলিকে কোনওভাবে খাট করেও দেখা যায় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এ সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত শিক্ষা হল কাউকে জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করানো এবং অন্যায় অত্যাচার করে অপরের উপর বিজয় লাভ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বরং শান্তি এবং সমাজের নিরাপত্তার বিপক্ষে যে কোনও ক্ষতিকর কাজ নিষিদ্ধ। রসূল করীম (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রেই নমনীয়তা এবং ক্ষমাপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। তিনি এখানে এই তারতম্য করেন নি যে মুসলমান কেবল মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ এবং দয়ালু আচরণ করবে। বরং তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে ধর্মমতের ভেদাভেদের উর্দ্ধে সমাজে সমস্ত মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। কাজেই নাইট ক্লাব, কনসার্ট হল স্টেডিয়ামে যে সব উগ্রবাদীরা আক্রমণ করে বা উন্মাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের উপর গাড়ি চাপিয়ে দেয়, তারা চরম অমানবিক ও অন্যায়পূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক নীতি শিখিয়েছে যেগুলির দ্বারা মানুষ জাতি মত নির্বিশেষে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে পারে। যেমন সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায় ভিত্তিক ব্যবসা সম্পর্কে বলেছেন এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা সুনিশ্চিত করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ দান করেছেন যে কখনও ছলচাতুরি দ্বারা সম্পদ অর্জন করা উচিত নয়। বরং মুসলমানদেরকে সৎ এবং বিশ্বস্ত হওয়ার শিক্ষা দান করা হয়েছে, যাতে মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জন্ম না নেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে অসৎ ব্যবসা এবং খারাপ সম্পর্ক সমাজের ঐক্য ও সংহতিকে দুর্বল করে দেয় এবং সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে। এমনিতেই পৃথিবীতে যেখানে ব্যক্তি পর্যায়ে ও সামগ্রিক স্তরে সংকীর্ণ স্বার্থ ও লালসার কারণে এত বেশি অস্থিরতা ও অস্বস্তি রয়েছে, সেখানে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় এবং সাম্যের নীতি বেশ গুরুত্বহ হয়ে ওঠে। (ক্রমশ.....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শান্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir